International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিহাস

স্বদেশ জানা

গবেষক, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ:
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি উপলব্ধি করেনি। ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে সাম্রাজ্যবাদী নীতি কে বাস্তবায়িত করার জন্য, ব্রিটিশ সরকার আরো বেশি কেন্দ্রীয়করণ করে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থচরিতার্থ করতে থাকে। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো বেশি দুর্বল করে তোলে। কারণ যাতে ব্রিটিশ শাসনকে কেন্দ্রিকরণ করে আরো বেশি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করা যায়। প্রাচীনকালে গ্রাম শাসনের ভিত্তি হিসাবে পঞ্চায়েত কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, তা এই সময় ব্রাত্য হয়ে পড়ে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের আগে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কখনো দানা বাঁধতে পারেনি। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে নানা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় পঞ্চায়েতি শাসন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। রয়াল কমিশন, মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনে এর চূড়ান্ত সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে ভারতের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ভারতীয় গণপরিষদ ও সংবিধান রচয়িতারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে ব্যাপারে সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে অনেকটা সুসংহত রূপদানের চেষ্টা করে।

সূচক:ব্রিটিশ সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ,লর্ড রিপন, রয়াল কমিশন, ১৯১৯আইন, ১৯৩৫আইন, গণপরিষদ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। কে. কে.পিল্লাই তার History of Local Self Government in the Madras Presidency শীর্ষক গ্রন্থে ব্রিটিশ শাসনকালে সাবেকি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পতনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেনঃ

(ক) ব্রিটিশ শাসনকালে বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা সমগ্র অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত। যে সমস্ত কাজগুলো একদা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে করতেন, ঔপনিবেশিক শাসকেরা সেই কাজগুলো নিজের উদ্যোগে সম্পাদন করায় স্থানীয় সরকার হিসাবে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালত সমগ্র দেশে বিস্তৃত হওয়ায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামসভার গুরুত্ব একেবারে হ্রাস পায়। গ্রামসভা কেন্দ্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এতে প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

(গ) ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশে দ্রুত রেলপথ, সড়কপথ এবং জলপথের বিকাশ ঘটানোর ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় প্রশাসন অতি দ্রুত স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার জন্য উপস্থিত হতে পারত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে স্বভাবতই পঞ্চায়েতের স্বাধীন অস্তিত্ব (ভৌগলিক কার্যগত দিক থেকে) বিনষ্ট হয়।

(ঘ) গান্ধীজীর অভিমত ছিল ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে আসার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রগুলো অকার্যকারী হয়ে পড়ে।[১]

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পরবর্তী একশত বছর ব্রিটিশ সরকার গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির পুর্নগঠনের কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এই সময় ব্রিটিশ প্রশাসন ছিল পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত।

কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক শাসকদের পৌর পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

রয়্যাল আর্মি সেনিটেশন কমিশন (১৮৬৩):ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৬৩ সালে রয়্যাল আর্মি স্যানিটেশন কমিশান গঠন করে। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সেনারা যে সমস্ত শহরে বসবাস করত সেই শহরগুলোর স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটানো।

লর্ড মেয়ো প্রস্তাব (১৮৭০)ঃ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রভাবে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল স্থানীয় সরকার নিয়ে নতুন করে ভাবতে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়লে আইনশৃঙখলা জনিত সমস্যা একদিকে যেমন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে স্থানীয় স্তরে রাস্তাঘাট পানীয় জল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এই অবস্থায় ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো স্থানীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। তার প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলে আইনশৃঙখলা জনিত সমস্যা কিছুটা হলেও মোকাবিলা করা, স্থানীয় স্তরে কর আদায় করা এবং উন্নয়নের দায়িত্ব ঔপনিবেশিক প্রশাসন থেকে সরিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অর্পণ করা।

স্থানীয় সরকার বিকাশে ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর প্রস্তাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনকালে তিনি প্রথম গর্ভনর জেনারেল ছিলেন যিনি উপলব্ধী করতে পেরেছিলেন নাগরিক কাজগুলো পরিচালনা করবার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় প্রশাসন। তার প্রস্তাবে প্রদেশগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় সরকারগুলোর অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সাহায্যের বিষয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করতে। মেয়ো প্রস্তাব অনুসারে কোনো প্রদেশ আইন তৈরী করেছিল এবং তাতে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল।[২]

লর্ড রিপন ও স্বায়ত্তশাসনঃ লর্ড রিপনের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৮২ খ্রিঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Local Self Government Act 1882)। রিপন চিন্তা করেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবাসীকে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ভাবধারায় শিক্ষিত করা সম্ভব। তিনি বলেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যথা মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা দান করে এই সংস্থাগুলির কাজকর্মে আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ রদ করা দরকার। নতুবা প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনে ভারতবাসী শিক্ষালাভ করতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ১৮৮২ খ্রিঃ তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব পাশ করেন। তিনি আমলাতন্ত্রকে এই ধারণা ত্যাগ করতে বলেন যে, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নয়।তিনি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দেশ দেন যে –

(১) প্রতি জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(২) লোকাল বোর্ডগুলি যত ক্ষুদ্র হয় ততই ভালো তাহলে তাতে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সর্বসাধারণের যোগাযোগ ভাল হবে।

(৩) জেলায় এজন্য একাধিক লোকাল বোর্ড (Local Board)স্থাপন দরকার।

(৪)লোকাল বোর্ড গুলিতে সরকারী সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্যের ১/৩ভাগের বেশী হবে না।

(৫) স্থানীয় বোর্ডগুলির চেয়ারম্যান বেসরকারী সদস্যেরা নির্বাচিত হবেন।

(৬) বোর্ডগুলিকে সরকার পরামর্শ ও পথনির্দেশ করতে পারবে।

(৭) ঋণগ্রহণ, বোর্ডের সম্পত্তি হস্তান্তর বা বোর্ডের পরিচালনার কোন উপ- আইন রচনা করতে গেলে সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হবে।

(৮) বোর্ডগুলিকে তার নির্দিষ্ট দায়িত্বপালনের জন্য অর্থবরাদ্দ করতে হবে।

(৯) যদি কোন লোকাল বোর্ড তার প্রদত্ত দায়িত্বপালন না করে তাহলে প্রদেশিক সরকার তার বেআইনী কাজকর্ম রদ করতে পারবে।
(১০) তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বোর্ডের কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।তিনি শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন গঠনের কথা বলেন। লর্ড রিপনের এইস্বায়ত্তশাসন আইনকে ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রথম ধাপ বলে অনেকে মনে করেন।[৩]

রিপনের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে সমালোচকেরা তার প্রস্তাবের পেছনে মূলত দুটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেন।

প্রথমত, লর্ড রিপন আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন, প্রাদেশিক সরকারকে উন্নয়নমূলক কাজের থেকে অব্যাহতি দিতে। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার গঠন করে সেই সরকারের উপর স্থানীয় স্তরের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন।এই উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পালন করলে ঔপনিবেশিক শাসকদের দায়ভার অনেককাংশে লাঘব হত।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রিপন এমনভাবে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন যারফলে শিক্ষিত বেকাররা এর থেকে উপকৃত হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ব্যস্ত রাখা সম্ভব তাদেরকে ক্ষমতা কর্তৃত্ব প্রভাব প্রদানের মধ্য দিয়ে।

কোনো কোনো সমালোচকের অভিমত হল উদারনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী রিপন ভেবেছিলেন যে, শিক্ষিত ভারতীয়দের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজের ক্রমবর্ধমান দাবি থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু একই সময়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই শিক্ষিত সমাজকে কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকারের অংশীদারিত্ব দেওয়া ঠিক হবে না। স্থানীয় সরকারী ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা সরকারের পরবর্তীস্তরের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত রিপনের প্রস্তাবটি যথেষ্ট নমনীয় ছিল। কারণ তিনি প্রাদেশিক সরকারকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয়ে। তবে সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে রিপনের প্রস্তাব যতজন না সমর্থন করেছিল তার থেকে বেশী মানুষ এর বিরোধীতা করেছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসক তাঁর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও বাংলা এবং বম্বের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর তাঁর এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল।

উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই লর্ড রিপন এদেশে থেকে চলে যান এবং পরবর্তীকালে ভাইসরয় হিসাবে আসেন লর্ড কার্জন। লর্ড কার্জন ছিলেন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ঘোর বিরোধী ফলে রিপন এর উদার প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপায়ণ করতে তিনি এগিয়ে আসেননি। তবে রিপনের প্রস্তাবের পরবর্তী পর্যায়ে কোনো কোনো প্রদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইন পাশ হয়েছিল। এরমধ্যে অন্যতম ছিল ১৮৮৪ সালে মাদ্রাজ বোর্ড সংক্রান্ত আইন এবং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।[৪]

রয়্যাল কমিশনঃ

এল.টি হউস এর নেতৃত্বে রয়্যাল কমিশন গঠন করা হয় ১৯০৬ সালে। স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ ক্ষমতার কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করাই ছিল রয়্যাল কমিশনের উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে জাতিগত ও ধর্মীয় বাধা দূর করে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার কার্যকরণ খোঁজা ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে বৃহত্তর আঙ্গিকে উপস্থাপন করা এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল।

কমিশন স্থানীয় সরকার গঠনের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন[৫]

(ক) জেলা আধিকারিকদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরন (খ) সম্পদের অভাব (গ) স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্বাচনের প্রতি অবিশ্বাস। কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন এবং বিকাশের প্রশ্নে আরও অধিক পরিমাণে ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশ করেছিল। যেমন – (ক) গ্রামের ছোটো দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলাকে পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারে আনা, (খ) গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পয়প্রণালী নিষ্কাশনে স্বাধীনভাবে পঞ্চায়েতকে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান করা, (গ) গ্রামের স্কুল তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনায় দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করা, (ঘ) গ্রামের পরিবহণ যোগাযোগের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে স্বাধীনভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে তারজন্য আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলেছিল কমিশন। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের কাজে জেলা আধিকারিকরা যাতে হস্তক্ষেপ না করে সেই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ রেখেছিল এই কমিশন। সামগ্রিকভাবে কমিশনের প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব না করলেও স্থানীয় সরকার পুনর্ঠর্নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। যেমন – (ক) স্থানীয় সরকারগুলোর কাজেই নিয়ন্ত্রণ এর পূর্ণ অধিকার (খ) অধিক সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য (গ) কর বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা (ঘ) নির্বাচিত চেয়ারম্যান।এছাড়া এই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল স্থানীয় সরকারের অনুদান এর বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট করা যাতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর স্বাধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

১৯১১-১২ সালে ঔপনিবেশিক ভারতে ১৯৮ টি জেলা বোর্ড গড়ে উঠেছিল এবং ৫৩৩ টি তালুক ছিল। জেলা বোর্ডগুলিতে অর্ধেক সদস্য নির্বাচক মণ্ডল দ্বারা নির্বাচিত হলেও মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের সেইসময় ভোটের অধিকার ছিল। জেলা বোর্ড এবং তালুক বোর্ডগুলি পাশাপাশি চৌকিদার পঞ্চায়েতআইনশৃঙখলার কাজ, স্কুলবাড়ি রাস্তা মেরামত সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করত। কদাচিৎ সরকার থেকে সামান্য অনুদান এই স্থানীয় বোর্ডগুলির কপালে জুটত।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ব্রিটিশ সরকারের সাথে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা অপর্ণের ব্যাপারে আরও বেশী সতর্ক হয়ে ওঠে। কারণ, যে সমস্ত ভারতীয় নেতারা স্থানীয় সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। ফলে লর্ড রিপনের প্রস্তাব এবং পরবর্তী বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা খুব বেশী আগ্রহ দেখায়নি।

*মন্টেগু চেমসফোর্ড প্রতিবেদন ও দ্বৈতশাসনে স্বায়ত্তশাসনের বিকাশঃ

ভারত সরকার মন্টেগু চেমসফোর্ড প্রতিবেদন গ্রহণ করে এবং ১৯১৮ সালের ১৬ই মে স্থানীয় সরকারের প্রশ্নে সরকার একটি পঞ্চায়েত বিকাশে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ১৯১৮ সালের প্রস্তাবে যে দিকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সেগুলো হল – (ক) এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক সরকারকে দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। (খ) স্থানীয় সংস্থাগুলো যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গড়ে ওঠে তার সুপারিশ করা হয়েছিল। (গ) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারনের কথা বলা হয়েছিল।(ঘ) স্থানীয় সংস্থাগুলোর সভাপতি বা চেয়ারম্যান যাতে নির্বাচিত হন সেকথা ছিল প্রস্তাবে। (ঙ) স্থানীয় সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে বাজেট প্রস্তুত করা, কর আরোপ করা এবং স্বাধীনভাবে ব্যয় বরাদ্দ করার কথা বলা হয়েছিল প্রস্তাবে।[৬]

মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রতিবেদন এবং ১৯১৮ সালের মে মাসে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত ঘোষণার পরই ১৯১৯ সালে পাশ হয় ভারত শাসন আইন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে স্থানীয় সরকার প্রদেশিক তালিকার অর্ন্তভুক্ত হয়। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত নতুন আইন গৃহীত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল –

(i)বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (১৯১৯)
(ii)বম্বে গ্রাম পঞ্চায়েত আইন (১৯২০)
(iii)মধ্যপ্রদেশ গ্রাম পঞ্চায়েত আইন (১৯২০)
(iv)মাদ্রাজগ্রাম পঞ্চায়েত আইন (১৯৩০)
(v)মাদ্রাজ স্থানীয় বোর্ড আইন (১৯২০)
(vi)সংযুক্তপ্রদেশ গ্রাম পঞ্চায়েত আইন (১৯২০)
(vii)পাঞ্জাব গ্রাম পঞ্চায়েত আইন (১৯২১)
(viii)বিহার এবং উড়িষ্যা গ্রাম প্রশাসন আইন (১৯২২)
(ix)আসাম গ্রামীণ স্থানীয় সরকার আইন (১৯২৬)

এছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলো যথা – বরোদা, ইন্দোর, মহীশূর প্রভৃতিতে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইন পাশ হয়েছিল।[৭]

১৯৩৫ খ্রি:ভারত শাসন আইন ও স্থানীয় সরকারঃ

১৯৩৫ খ্রি: ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক সরকারগুলি ক্ষমতা প্রদান করেছিল। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় এবং সেইসঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত সহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিকরণের ছাড়পত্র পায়। বেশীরভাগ প্রদেশে স্থানীয় বোর্ড ক্ষমতা পায় কর কমানোর। লোকাল বোর্ডগুলি সংগঠিত ছিল ১৯৩৯ খ্রি:দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কোন বিষয় খোলসা করেনি। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি ১৯৪৭ খ্রি.দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মতার্দশগত একটি অংশ হল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। গান্ধীজীর অন্যতম আদর্শ ছিল গ্রাম স্বরাজ। গ্রামীণ সরকার পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠন করবে। এক্ষেত্রে গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা, নূন্যতম শিক্ষিত করা নির্বাচন করবেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন গ্রাম স্বরাজএর মাধ্যমে গ্রামগুলি স্বনির্ভর হবে। মানুষেরা স্বনির্ভর হবে আর স্বশাসিত নিজের সরকার হবে। আচার্য বিনোবাভাবে গ্রামদানআন্দোলন সংগঠিত করেন। এইসময় অনেক গ্রামদান করা হয়। যেখানে মানুষই প্রধান সেখানে প্রকৃত স্বরাজ্য। গ্রামগুলিতে গ্রামসভা সমস্ত ক্ষমতা লাভ করত।

দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হয় জাতীয় আন্দোলন ও গান্ধীজীর মতার্দশে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রথম খসড়া সংবিধানে পঞ্চায়েতের জন্য কোনো জায়গা রাখা হয়নি।

সংবিধানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গণপরিষদে বিতর্কঃ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজগঠনের ধারণা জণগনের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমর্থন লাভ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পঞ্চায়েতি রাজ গঠনের বিষয়টিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজী লিখেছিলেন ......চিরকাল আমি বিশ্বাস করেছি এবং তা অসংখ্যবার বলেছি যে ভারতকে তার গুটিকয়েক শহরের মধ্যে পাওয়া যাবে না, বরং তার সন্ধান মিলবে গ্রামে...।

গান্ধীজী আরও লিখেছিলেন যে, ...ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিচুতলা থেকে শুরু হবে, সেইকারণে প্রতিটি গ্রাম পরিপূর্ণ ক্ষমতা সরকারে প্রজাতন্ত্র বা পঞ্চায়েত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে......।[৮]

কিন্তু স্বাধীন ভারতের মূল সংবিধানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নূন্যতম গুরুত্ব দিতে রাজি হননি সংবিধানের প্রনেতারা। আম্বেদকর খসড়া সংবিধান পেশ করে সংবিধান সভায় মন্তব্য করেছিলেন যে, ...খসড়া সংবিধানের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা হল এর কোনো অংশেই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। অনেকেই মনে করেন নতুন সংবিধানের রচনা হওয়া উচিৎ সাবেকি হিন্দু রাষ্ট্রের ধাঁচে...আবার কেউ কেউ মনে করেন কোনো কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারেরই প্রয়োজন নেই। তারা চান ভারত গঠিত হোক গ্রামীণ সরকারকে নিয়ে। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রতি যোদ্ধাদের ভালোবাসা সীমাহীন এবং মর্মস্পর্শী...গ্রামীণ সম্প্রদায় ভারতীয় ইতিহাসে কতটুকু ভূমিকা পালন করেছে তা আমরা মোট কয়েকবার আলোচনা থেকে উপলদ্ধি করতে পারি ...যারা গ্রামীণ সম্প্রদায়কে নিয়ে গৌরব বোধ করেন তারা নূন্যতম সচেতন নন যে, এই গ্রামীণ সম্প্রদায় রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই নূন্যতম ভূমিকা পালন করেছে ...[৯]

আম্বেদকর গ্রামগুলোকে আঞ্চলিকতার ডোবা, অজ্ঞতার নালা, সংকীর্ণ মানসিকতাপূর্ণ এবং সাম্প্রদায়িকতায় জর্জরিত বলে অভিহিত করেছিলেন। খসড়া সংবিধানে পঞ্চায়েতকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগের ব্যাপারে আম্বেদকর বলেছিলেন,এই গ্রাম সাধারণতন্ত্রগুলি ভারতের অধঃপতন ঘটিয়েছে। আমি বিস্মিত যে, যারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করেন তারাই এর সমর্থক রূপে এগিয়ে এসেছেন। আঞ্চলিকতা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া গ্রামে আর কি আছে? খসড়া সংবিধানে গ্রামকে বাতিল করে ব্যক্তিকে একক হিসাবে ধরা হয়েছে বলে আমিআনন্দিত।[১০]

৫ নভেম্বর আম্বেদকরের বক্তব্যের উপর বির্তকের সূচনা করে এইচ. ডি কামাথ তার বক্তব্যের জন্য আম্বেদকরকে তীব্র আক্রমণ করেন। কামাথ উল্লেখ করেন যে, আম্বেদকর যেহেতু পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত তাই ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে পশ্চিমি চিন্তাবিদদের বক্তব্যকে আশ্রয় করেই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কামাথ আরও উল্লেখ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের গ্রামীণ জীবনকে ভালোবাসাতে শিখিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে, গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে আমাদের যদি সহানুভূতি না থাকে তবে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। আগামী দিনে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রশ্নে শুধু ভারতেই নয় সারা পৃথিবী জুড়ে প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকরণ এবং গ্রাম ও শহরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, যার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রনেতা গড়ে উঠবে।[১১]

একই বির্তকে অংশ নিয়ে অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গা দক্ষিণ ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাফল্য উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, বি. আর আম্বেদকর যদি দক্ষিণ ভারতের পঞ্চায়েতের সাফল্য সম্পর্কে নূন্যতম অবগত থাকতেন তবে গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করতেন না।তিনি আরও বলেন যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে গণতন্ত্রের আস্বাদ নেওয়ার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সাধারণ নাগরিকদের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। আগামী দিনে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হতে বাধ্য সেই কারণে অধ্যাপক রঙ্গা মূল সংবিধানে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন।[১২]

বি .আর.আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় সমালোচনার হাত থেকে বাঁচার জন্য বেগম রসুল মন্তব্য করেন যে, আধুনিক প্রবণতা হল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব বা সংস্থাদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

করা। সংবিধান সভায় বি.আর.আম্বেদকরের মন্তব্যের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে ডঃ মনমোহন দাস সদস্যদের মনে করিয়ে দেন যে, খসড়া সংবিধান রচিত হয়েছে খসড়া কমিটির দ্বারা। তাই ব্যক্তিগতভাবে আম্বেদকরকে সমালোচনা করা ঠিক নয়। তার সভার মতে সংবিধান সভা স্বেচ্ছায় পঞ্চায়েত গঠনের বিষয়টি রাজ্যের আইন সভার নিকট ছেড়ে দিয়েছে। বির্তকের স্বপক্ষে বলতে উঠে আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার উল্লেখ করেন যে, সংবিধানে গ্রামীণ সম্প্রদায়কে যথার্থভাবেগুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়ে যে বির্তক উঠেছে তা ঠিক নয়। কারণ যে বিপুল পরিমাণে ক্ষমতা প্রদেশিক সরকারকে প্রদান করা হয়েছে সেই ক্ষমতার বলে প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সরকার গঠন করতে স্বক্ষম হবে। গ্রামকে প্রশাসনিক একক হিসাবে বিবেচনার দ্বার রাজ্য সরকারের।[১৩]

এবিষয়ে বির্তক শেষ হলে সংশোধনী প্রস্তাবটি মূল সংবিধানের ৪০নম্বর ধারায় স্থান পায়। সংবিধানের ৪০নম্বর ধারায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির ফলে গ্রামীণ পঞ্চায়েত গঠনের দায়িত্ব একান্তভাবে রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। কারণ, ৪০ নম্বর ধারা নির্দেশমূলক নীতিতে স্থান পাবার ফলে রাজ্য সরকার বাধ্য ছিল না পঞ্চায়েত গঠনের বিষয়ে। কারণ ৪০ নম্বর ধারা আদালতে বলবৎ যোগ্য নয়। স্বভাবতই এরফলে স্বাধীন ভারতে একাধিক কমিটি ও কমিশন গঠন হলেও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা না থাকায় রাজ্য সরকারগুলি পঞ্চায়েত গঠনে তাগিদ দেখায়নি। মূল সংবিধানের ৪০ নম্বর ধারা ছাড়া সপ্তম তপশীলে ২ নম্বর তালিকায় স্থানীয় শাসনের আর একবার উল্লেখ আছে। অবশেষে স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পর ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীয় মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে মূল সংবিধানের ২৪৩ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। চক্রবর্ত্তী, বিশ্বনাথ, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, পৃ – ৩৬।

২। Rao,N. R., Municipal Finance in India, Inter-India Publication, New Delhi, 1986.

৩। মাইতি,প্রভাতাংশু, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা পৃ – ২০।

৪। চক্রবর্ত্তী,বিশ্বনাথ, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, পৃ – ৩৯।

৫। Rao,N. R., op.cit;

৬। Ghosh,Ratna and Pramanik,Alok Kumar, Panchayat System in India: Historical, Constitutional and Financial Analysis, Kanishka Publishers, New Delhi, 2007, pp. 208-09.

৭।Ibid, pp. 212-213.

৮। Gandhi,M.K, Panchayati Raj, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1959.

৯। Kashyap, Anirban, Panchyati Raj: Views of the Founding Fathers and Recommendation of Different Committees, Lancers Books Delhi, 1989, pp. 28-29.

১০।Ibid; P. 29.

১১।Ibid, pp. 31-33.

১২।Ibid, pp. 46-47.

১৩।Ibid, pp. 35-53.